

বীজমন্ত্র দু'ধরনের হয়.

একটি বীজ মন্ত্র (সংস্কৃত: ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ) ধ্যান বা যোগ অনুশীলনে ব্যবহৃত এক-
অক্ষর শব্দ। সংস্কৃত বাক্যাংশ বীজ মন্ত্রেরে সরাসরি অর্থ, " **বীজ মন্ত্র** "

বীজমন্ত্র দু'ধরনের হয়। "ওঁ" দিয়ে যে বীজের শুরু সেগুলো ব্রহ্মবীজ আর "হ্রীং"
দিয়ে যে বীজগুলো আরম্ভ ওগুলো মায়াবীজ।

বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে গেলেই শুধু হবে না, গুরু যদি সেই বীজের কার্যক্রম আর
মানগুলো বলে না দেন, তাহলে পাখপিড়া বুলরি মতন শুধু বীজ জপই চলবে। চলবে
আচমন, ক্রিয়া, পুজো। কিন্তু বীজ কোনওরকম কোনও কাজ করবে না।

গুরু বীজ জাগিয়ে শিষ্যকে দেন। একে বলা হয়., কুঞ্জ দিওয়া। কুঞ্জ হিহ, চাবরি
গোছা। শিষ্যেরে দেহটা চাবি মারা থাকে। গুরু কুঞ্জ দিয়ে তালাটা খুলে দেন। বীজের
ভেতরও একইরকম তালা থাকে। যে গুরু বীজ জাগানোর প্রক্রিয়া না - করেই শুধুই
মন্ত্র দিয়ে খালাস, সে মন্ত্রেরে লক্ষ জপেও কোনও ফল নেই। মন্ত্র কাজ করবে
না।

সজেন্যই অধিকারী নরিখি বীজেরে বিভাজন আছে। **পুরুষ বীজমন্ত্র**, স্ত্রীবীজমন্ত্র
আর নপুংসক বীজমন্ত্র -- এই তিন ধরনের বীজ আছে।

গুরু যে বীজ দলিনে সে বীজেরে অর্থ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ তিনি যদি না - করে দেন,
তাহলে সারাজীবন আসনে বসে - বসে বীজ জপ করেও কোনও আধ্যাত্মিক উন্নতি
আসবে না।

সজেন্যই বীজেরে মানবে গুরুর কাছে জনে নতি হবে। বুদ্ধিমান শিষ্য গুরুকে তাই
যাচাই করে নেন।

গুরু যদি জ্ঞানমার্গী না হন, তাহলে শিষ্যের দুর্গতির শেষ নেই।

জ্ঞান কিন্তু কেবল শাস্ত্রীয় জ্ঞান নয়। শাস্ত্রীয় জ্ঞান দিয়ে ভালো পুজো, হোম
করা চলে, কিন্তু জ্ঞান হল এক্ষেত্রে ব্রহ্মোপলব্ধি।

ওঁ হল বিশুদ্ধ নাদ।

মুদ্রা ও বীজমন্ত্রেরে সঙগে সরাসরি যোগ আছে কুণ্ডলিনীর। ওটা খুলতে সাহায্য করবেন
যে গুরু তিনিই সিদ্ধ। তিনিই জ্ঞানমার্গী। তিনি লাল কাপড় পরে, সিঁদুর লেপে বসে
আছেন মাযেরে কাছে, না কতি নিপ্প্যান্ট, টি - শার্ট পরে আছেন সেটা এখানে বিষয় নয়।

জপেরে আগে মানটো না জানলে ও বীজ কীভাবে কাজ করবে? গুরু অর্থ ভেঙে, বীজেরে
উৎপত্তি ও বকিাশ শরীরে কীভাবে হচ্ছে সেটা দেখিয়ে দেন। যদি গুরু এ সমস্ত না

দেখিয়ে থাকেন, তবে সারাজীবন ওই মাযের বীজ নিয়ে পুজো করে যেতে হবে খালি আধ্যাত্মিকি জাগরণ ঘটবে না কোনওভাবে। এজন্যই অনেকে দীর্ঘদিন মন্ত্র নিয়ে কোনও অনুভূতি পান না জীবনে। গুরু বীজ জাগিয়ে দেন না বলে মাতৃকার অনুভূতি আসে না।

মন্ত্রের ভেতরই রয়েছে পুরুষ, প্রকৃতি আর নপুংসক।

যদি মন্ত্রের শেষে "স্বাহা" কথাটি জোড়া থাকে গুরু - প্রদত্ত বীজে, তবে ওটা **স্ত্রী-বীজমন্ত্র**।

মন্ত্রের আগে "হুঁ" থাকলে ওটা হল **পুরুষ-বীজমন্ত্র**।

যদি মন্ত্রের শেষে "নমঃ" যুক্ত মন্ত্রগুলো "নপুংসক-বীজমন্ত্র"।

বলা হয়., --->>> **মন্ত্রবন্দিয়া === মন্ত্র হল পুরুষ & বন্দিয়া হল স্ত্রী**

মন্ত্রের শুরুতে ওঁ লাগানো যদি থাকে, আর শেষে যদি নমঃ কথাটা থাকে থাকে, তাহলে ওগুলো সব গৃহস্থদের জপের মন্ত্র।

- 1 অক্ষরের মন্ত্রগুলোই বীজমন্ত্র।
- 2 অক্ষরের মন্ত্রের নাম, কর্তরীমন্ত্র।
- 3 থেকে 9 পর্যন্ত অক্ষরের মন্ত্রগুলো হল, বীজমন্ত্র।
- 10 থেকে 20 অক্ষরের মন্ত্র হলই, তখন মালামন্ত্র।

বীজমন্ত্রের মন্ত্রের দু'রকম শক্তি, বাচক ও বাচ্য, প্রথমটি দ্বিতীয়টির স্বরূপ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়টি জ্ঞাতব্য, প্রথমটি জানার পদ্ধতি। মন্ত্রের বাচক সত্য বাক্যের দ্বারা গঠিত, বাক্য শব্দের দ্বারা, শব্দ ধ্বনির দ্বারা। ধ্বনির সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম পর্যায় দুটির নাম বিন্দু ও নাদ। ধ্বনির প্রকাশ হয় বর্ণ বা অক্ষরে, তাই বর্ণ বা অক্ষরই বীজ। বর্ণই ভাব ও রূপের স্রষ্টা ও তাদের থেকেই সৃষ্টি বীজমন্ত্রের বোধ বা জ্ঞান হয়। বহু বটবৃক্ষ যেন একটি কৃষ্ণ বীজের মধ্যে সুপ্ত থাকে সেইরূপ সমুদয় তত্ত্ব ওই একাক্ষর বীজের মধ্যে বর্তমান।

বিন্দু হচ্ছে শবির প্রতীক, বীজ হচ্ছে শক্তির প্রতীক আর নাদ হচ্ছে শবি-শক্তি সামরস্য।

এই মন্ত্ররহস্য সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সমীকৃত। শবি জ্যোতি বা প্রকাশরূপে বমিশ্রস্বরূপ শক্তির মধ্যে অনুপ্রবেশিত হওয়ার সময় বিন্দুরূপ ধারণ করেন, যার ফলে নাদ বা সূক্ষ্ম শব্দের উৎপত্তি হয়। বিন্দু পুং-বীজ (শুক্ল) এবং নাদ স্ত্রী-শক্তি (রজঃ)। এদের মিলনই হচ্ছে কামকলা। বিন্দু বিশ্বজগতের নমিত্তিকারণ, নাদ উপাদানকারণ এবং কামকলা সৃষ্টির পদ্ধতি। দেহাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতরূপ, মানবিক সৃষ্টিপদ্ধতি কামকলা, জগৎ সৃষ্টির পদ্ধতি তাই। যদিও চরমতত্ত্বের দিক থেকে অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির মত শবি ও শক্তি অভিন্ন, তথাপি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এদের একটি দ্বৈত ভূমিকা আছে। শবি সৃষ্টির পুরুষ আদর্শ, শক্তিস্ত্রী, উভয়ের মিলন বা কামকলা সৃষ্টির পদ্ধতি। সৃষ্টির প্রকৃতি একটি চক্রের মত যেখানে বার বার অনুবর্তন চলছে। শক্তি তাঁর উৎস থেকে নির্গত হয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একটি চক্র সম্পূর্ণ করে আবার তাঁর মূল উৎসে মিলিত হচ্ছে।

মন্ত্র যমেনটা হোক সটো কোনও ব্যাপার নয়, আসল হল গুরু ওটা জাগিয়ে দিচ্ছেনে
কনি কুণ্ডলিনীস্থ চতেনায়।

গুরুর স্মরণাপন্ন হয়ে ওটা জাগাতে হবে আগভোগে। না হলে পূজো, হোম সব হবে,
কিন্তু বীজের শরীরময় স্পন্দনখানি কখনও বোঝা যাবে না।

মন্ত্রের মধ্যে অসাধারণ শক্তিনিহিত থাকে। সুতরাং ‘এই মন্ত্র জপ করলে কি এরূপ
ফল হইতে পারে’ এ প্রকার বতিরূক বা সংশয় পোষণ করলে সাধকের সাধনায় বহ্নি ঘটবে।
এ শ্রমের সংশয় সাধককে অধোগামী করে থাকে। শ্রদ্ধা ও পরিশ্রম বশির্বাশরে সাথে
সাধনপথে অগ্রসর হলে সাধক অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করেন। গুরু, মন্ত্র, যন্ত্র ও দেবতার
সাথে সাধক আপনার একাত্ম অনুভব করবেন— এটাই সাধনার চরম কথা বলে।

"ইত্থং মাতা বদীষা চক্রং স্বগুরুঃ স্বয়ঞ্চতেতি"।

"পঞ্চানামপি ভদোভাবো মন্ত্রস্য কটলিকার্থোহয়ম্"।

অর্থাৎ : প্রমাতা (শবি), ইষ্টদেবতা, তাঁর চক্র (মন্ত্র ইত্যাদি) গুরু এবং সাধক এই
পাঁচের ভদোভাব অর্থাৎ অভদেই মন্ত্রের গুঢ়ার্থ।

মন্ত্রজপে সিদ্ধিলাভ করতে হলে মন্ত্রচতৈন্য করে এবং মস্ত্রার্থ পরজিঞ্জাত
হয়েই যথাবধি জপ করতে হয়। কেননা, মন্ত্রসিদ্ধিলাভ করতে হলে, মন্ত্র যবে
অক্ষরে, যবে ভাবে, যবে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত আছে, তা সত্যভাবে জপ করতে হয়। তবেই
মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যাবে। তাই কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে—

মনোহন্যত্র শবিরহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।

ন সখিন্তি বরারোহে কল্পকোটশিতরৈপি। (কুলার্ণবতন্ত্র)

অর্থাৎ : মন্ত্রজপকালে মন, পরম-শবি, শক্তি এবং বায়ু পৃথক পৃথক স্থানে থাকলে
অর্থাৎ ইহাদ্বয়ের একত্র সংযোগ না হইলে শতকল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।
সরস্বতীতন্ত্রের ষষ্ঠ পটলে জগৎগুরু যোগেশ্বর মহাদেব বলেছেন—

অন্ধকারগৃহে যদ্বৎ ন কঞ্জিচি প্রতভাসতে।

দীপনীরহতি মন্ত্রস্তথৈ পরিকীর্ততিঃ।।- (সরস্বতীতন্ত্র-৬/৪)

অর্থাৎ : আলোহীন অন্ধকাচ্ছন্ন গৃহমধ্যে যমেন কোন বস্তুই প্রতভাসিত হয় না
বা দেখা যায় না, সেইরূপ দীপনীরহীন মন্ত্রও তত্ত্বপ্রকাশনে সমর্থ হয় না ফলে
মন্ত্রজপে কোন ফল হয় না, এমত কথাটি হইয়াছে।

এখন মন্ত্রার্থ কী, তা জানা যাক। তন্ত্রমতে মন্ত্র ও দেবতার অভদেজ্ঞানই মন্ত্রার্থ। মন্ত্রার্থ মানে শব্দার্থ নয়। মন্ত্রেরে ভাবার্থ উপলব্ধিকরা শক্তিতে হবে, এবং তা সাধনসাপেক্ষ। মন্ত্রার্থ প্রসঙ্গে রুদ্রযামলে বলা হয়েছে—

মন্ত্রার্থ-দেবারূপ-চিন্তনং পরমশ্বেষরি

বাচ্যবাচকভাবে অভদো মন্ত্রদবেয়োঃ।।- (রুদ্রযামল)

অর্থঃ : ইষ্টদেবার মূর্তিচিন্তা করলি অর্থঃ দেবার শরীর ও মন্ত্র অভিন্ন এইরূপ ভাবলি মন্ত্রার্থ ভাবনা হয়। দেবার রূপচিন্তাই মন্ত্রার্থ। মন্ত্র ও দেবতা বাচ্য-বাচক ভাবে অভিন্ন।

সকল মন্ত্রেই দুইটি শক্তি নহি থাকে। একটি বাচ্য শক্তি, অপরটি বাচক শক্তি। মন্ত্রেরে প্রতাপিদ্য দেবতাই মন্ত্রনষ্টি বাচ্য শক্তি এবং মন্ত্রময়ী দেবতাই বাচক শক্তি। বীজ যেরূপ ফলেরে অন্তরেই নহি থাকে, বাচ্য শক্তিও সেইরূপ বাচক শক্তির অন্তর্নহি। ফলেরে বহিঃবরণ ভেদে না করলি অভ্যন্তরে বীজকে লক্ষ্য করা যায় না, সেইভাবে বাচক শক্তির আরাধনা না করলি বাচ্য শক্তির স্বরূপ জানতি পোরা যায় না। বাচ্য শক্তির সামর্থ্যে মন্ত্র জীবতি থাকে এবং বাচক শক্তির সামর্থ্যে রক্ষতি হয়। সুতরাং এই উভয় শক্তির একটিকেও বাদ দবার উপায় নাই। একটিকে বাদ দলিই মন্ত্র নষ্ট হয় হইয়া যাইবে। মন্ত্রকে অক্ষর-রূপে মনে না করবার আরও হেতু আছে। অক্ষরাত্মক মন্ত্র শব্দব্রহ্মের প্রতীক মাত্র----অক্ষরজ্ঞান-রূপ সংবদিরে অধিষ্ঠাতা স্বয়ং মহেশ্বর। শব্দ এবং অক্ষরসমূহ তাহারই শক্তি। তাহাতে অনন্ত শক্তি-বৈচিত্র্যেরে উদয় এবং লয় হইতছে। আর অক্ষরসমূহেরে মধ্যে তদীয় শক্তিব-রূপ একই সাধারণ ধর্ম আছে বলিয়া প্রতীক-রূপ অক্ষরসমূহেরেও আত্ম্যন্তকি ভেদে নাই। এই দৃষ্টিতে বিচার করলি বোঝা যায়— প্রণবাদি সকল বীজ মন্ত্রই তাহার বাচক। শক্তিও শক্তিমানেরে মধ্যে আত্ম্যন্তকি ভেদে স্বীকৃত হয় নাই।’

মন্ত্রে দেবতা মন্ত্রবাচ্য এবং মন্ত্র দেবার বাচক, সুতরাং বাচ্য বজ্জিঞাত হলে বাচক প্রসন্ন হন। এভাবে মন্ত্রেরে অর্থ পরজিঞাত হয়ে জপ না করলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। তাই সবারই আপন আপন ইষ্টদেবার, আপন আপন মন্ত্রেরে অর্থজ্ঞান থাকা আবশ্যক। শাস্ত্রে মন্ত্রার্থজ্ঞানেরে এক উৎকৃষ্ট উপায় লিখিত আছে। সে উপায়ে সবাই সকল প্রকার মন্ত্রার্থ পরজিঞাত হতে পারেন। তার দ্বারা মন্ত্রেরে অর্থ আপনই সাধক-হৃদয়ে প্রতফিলতি হয়ে থাকে।

গুরুর স্মরণাপন্ন হয়ে ওটা জাগাতে হবে আগভোগে। না হলে পুজো, হোম সব হবে, কিন্তু বীজেরে শরীরময়, স্পন্দনখানিকখনও বোঝা যাবে না।

